সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

বৈদিক সাহিত্য

সুদূর অতীতে আর্যদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ভূমিতে স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছিল এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য যার মধ্যে বিধৃত আছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশ যখন জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখার অভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গহন তমিশ্রায় আচ্ছন্ন, সে সময় আর্যসভ্যতার জ্ঞানগরিমায় ভারতবর্ষ মহীয়ান। ঋক্‌সংহিতার কাল থেকে বেদাঙ্গ রচনার অন্তিম পর্ব পর্যন্ত যে সুবিশাল সাহিত্য কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির নয়, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেছিল তাকেই বৈদিকসাহিত্য নামে অভিহিত করা হয়। এই সাহিত্যকে পৃথিবীর উন্নততম প্রাচীন সাহিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় যোগে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন। 'বেদ' কথাটির অর্থ—জ্ঞান। জ্ঞান বলতে পরমজ্ঞানই এখানে বোধ্য। এই জ্ঞান পার্থিব জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। সেই অতীন্দ্রিয় পরম জ্ঞান যে শাস্ত্র থেকে লাভ করা যায় তাকেই বলা হয় বেদ। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।"

সংহিতাকার মনুর মতে বেদ হল সমস্ত ধর্মের মূল—"বেদঃ অখিলধর্মমূলম্" (মনু, ২/৬)। সায়ণাচার্যের মতে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় যে গ্রন্থ থেকে লাভ করা যায় তাই বেদ—"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ" (ঐতরেয় ব্রা, ভাষ্যভূমিকা)। বস্তুতঃ ধর্ম, কর্মফল, যজ্ঞ, যজ্ঞফল, স্বর্গ, পরলোকতত্ত্ব, অদৃষ্ট ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞান এবং ব্রহ্ম, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের আকরস্বরূপ এই বেদ। বেদ নিত্য, অভ্রান্ত, স্বতঃসিদ্ধ, সনাতন ও অপৌরুষেয়। পরমব্রহ্মের নিঃশ্বাসরূপে বেদ স্বপ্রকাশ, ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। শ্রুতি, ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্ প্রভৃতি বেদের প্রতিশব্দ। আচার্য-শিষ্য-পরম্পরায় বেদ শ্রবণের মাধ্যমেই রক্ষিত হত বলে এর আর এক নাম 'শ্রুতি'। অনেকের মতে ঋক্, সাম, যজুঃ—এই তিনটি বেদের সমষ্টিকে বলা হয় 'ত্রয়ী'। পরবর্তীকালের সংযোজন বলে অথর্ববেদ ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার অনেকের মতে যজ্ঞের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই বেদত্রয়কে ত্রয়ী বলা হয়। যজ্ঞসম্পাদনে অথর্ববেদের কোন ভূমিকা না থাকায় তা ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত নয়। অপর একটি মতানুসারে বেদ ত্রিবিধ মন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত, তাই-এর আর এক নাম ত্রয়ী। ঋক্‌মন্ত্র পদ্যাত্মক, সামবেদের মন্ত্র গীতিময় এবং যজুর্বেদের মন্ত্র গদ্যাত্মক। অথর্ব বেদের মন্ত্র এই

ত্রিবিধ লক্ষণান্বিত, তাতে কোন অভিনবত্ব নেই। সুতরাং ত্রিবিধ লক্ষণযুক্ত মন্ত্রসমষ্টিই হল ত্রয়ী।

বেদের মূলতঃ দুটি অংশ—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। তাই বলা হয়েছে—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"। বেদের মন্ত্রভাগে আছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি, দেবমহিমা কীর্তন, দেবতার অনুগ্রহ, অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনা প্রভৃতি। ব্রাহ্মণভাগে আছে—বিবিধ যাগযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ, মন্ত্রের বিনিয়োগ, ইতিহাস, পুরাকীর্তি, দেবতা, যজ্ঞফল প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা। এককথায় বেদের মন্ত্রভাগ হল জ্ঞানকাণ্ড, আর ব্রাহ্মণভাগ হল কর্মকাণ্ড। বেদের মন্ত্রভাগ মূলতঃ পদ্যে রচিত, তবে কিছু কিছু অংশ গদ্যে নিবদ্ধ। ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত।

বৈদিক মন্ত্রের সংগ্রহক গ্রন্থ সংহিতা নামে পরিচিত। সংহিতার সংখ্যা চার—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্রাহ্মণ বিদ্যমান। প্রত্যেক মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও দু'ধরনের গ্রন্থ পাওয়া যায়—আরণ্যক ও উপনিষৎ। বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্গত আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে যেগুলিকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ সংখ্যায় ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ। বেদের অর্থাবগমের জন্য বেদাঙ্গের জ্ঞান অপরিহার্য।

বেদের কাল

ভারতীয়দের দৃষ্টিতে বেদ অপৌরুষেয় এবং পরমব্রহ্মের নিঃশ্বসিত। কোন পুরুষের রচনা নয় বলে এবং গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় দীর্ঘকাল শ্রুতিতে রক্ষিত বলে বেদের প্রকৃত কাল নিরূপণ দুষ্কর। সুতরাং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের দ্বারা কবে মন্ত্র কবে দৃষ্ট হয়েছিল, তার কতকাল পরেই বা তা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা নির্ণয় করা অসম্ভব। বেদ অপৌরুষেয় নয় এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই সর্বপ্রথম বেদের কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। এবিষয়ে পথিকৃৎ হলেন অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার। তিনি মনে করেন যে, ভারতভূমিতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে বৌদ্ধধর্ম ভারতে বিস্তারলাভ করে। সুতরাং তার দু'শ বা তিনশ বছর পূর্বে ব্রাহ্মণ অংশ সংকলিত হয় এবং তারও প্রায় দু'শ বছর পূর্বে সংহিতাভাগের সংকলন সমাপ্ত হয়। তাই ম্যাক্সমূলারের মতে ৮০০—৬০০ খ্রীঃ পূঃ ব্রাহ্মণসাহিত্যের এবং ১০০০—৮০০ খ্রীঃ পূঃ সময়কালই হল বৈদিক সংহিতার সংকলন কাল। এটি সম্ভবতঃ বৈদিকসাহিত্যের শেষ স্তরের রচনাকাল। তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা বৈদিক সূক্তসমূহের সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করতে পারে। তাই ম্যাক্সমূলার মন্তব্য করেছেন—"Whether the Vedic hymns were composed 1000 or 1500 or 2000. 3000 years B. C., no power on earth will ever determine" (Gifford Lectures on Physical Religion, 1889). লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের মধ্যে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ সংকলিত হয়েছিল। জার্মান অধ্যাপক এইচ্ জ্যাকোবি বেদে উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার করে আনুমানিক ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে বৈদিক সংহিতার সংকলন কালরূপে চিহ্নিত করেছেন। ম্যাকডোনালের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৩০০ বা ১৫০০ অব্দ হল ঋগ্বেদের রচনাকাল।

জার্মান পণ্ডিত ভিন্তারনিৎস উপরিউক্ত কোন মতকে সমর্থন করেন নি। তিনি ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্রভাবে বেদের কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বা ২৫০০ বৎসর পূর্বে বেদ প্রথম রচিত হয় এবং খ্রীঃ পূঃ ৭৫০—৫০০ অব্দে বৈদিকসাহিত্য তার পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। আবার ঐতিহাসিকদের মতে ভারতবর্ষের সিন্ধুসভ্যতা বৈদিকসভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দকে সিন্ধুসভ্যতার আবির্ভাবকাল রূপে চিহ্নিত করা হয়। এদিক থেকে বিচার করলে খ্রীষ্টজন্মের ২৫০০—২০০০ বৎসর পূর্বকে বা তার সমসাময়িক কালকে বৈদিক সভ্যতার আবির্ভাব কাল বলা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল নির্ণয়ে নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হতে পারেন নি। বৈদিক সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতা শুধু নয়, এর বৈচিত্র্যও সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে। সুদূর অতীতের কোন রহস্যময় নিভৃতে এই সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা আজও রহস্যাবৃত। অনাগত ভবিষ্যতে হয়তো নতুন গবেষণালব্ধ তথ্য এই বিস্ময়বিমুগ্ধ রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে পারবে।

ঋগ্বেদ সংহিতার বিষয়বস্তু

ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই সংহিতা চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋক্‌সংহিতার প্রাচীনত্ব সর্ববাদিসম্মত। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল ঋগ্বেদ। সামবেদ সংহিতায়, যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শুক্লযজুর্বেদে এবং অথর্ববেদে বহুসংখ্যক ঋক্‌মন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। ঋক্‌সংহিতার দু'প্রকার বিভাগ দেখা যায়—(১) মণ্ডল, অনুবাক্, সূক্ত ও ঋক্, (২) অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র। প্রথম বিভাগটি বৈদিক অনুষ্ঠানের এবং দ্বিতীয়টি বেদাধ্যয়নের উপযোগী। ঋগ্বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রকে বলা হয় ঋক্। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে সূক্ত গঠিত। কতকগুলি সূক্তের সমষ্টিকে বলা হয় অনুবাক। এরূপ কয়েকটি অনুবাক নিয়ে এক একটি মণ্ডল। ঋগ্বেদে মোট দশটি মণ্ডল, পঁচাশিটি অনুবাক, ১০১৭টি সূক্ত এবং ১০,৪৭২টি ঋক্ আছে। এছাড়া এগারটি 'বালখিল্য' সূক্ত এবং কতকগুলি 'খিলসূক্ত' বা পরিশিষ্ট ঋগ্বেদসংহিতায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ অনুযায়ী কতকগুলি অধ্যায় নিয়ে অষ্টক গঠিত। এই বিভাগ অনুসারে ঋক্‌সংহিতায় আছে আটটি অষ্টক, চোষট্টি অধ্যায় এবং দু'হাজার ছয়টি (২০০৬) বর্গ।

পূর্বে ঋক্‌সংহিতার অনেকগুলি শাখা ছিল। কূর্মপুরাণে একুশটি, বিষ্ণুপুরাণে নয়টি, ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে পনেরটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান শাকল ও বাস্কল ভেদে ঋগ্বেদের দুটি শাখা পাওয়া যায়। শাকল শাখা মতে ১০১৭টি সূক্ত এবং বাস্কল শাখা মতে ১০২৮টি সূক্ত ঋক্‌সংহিতার অন্তর্গত। এই শাখায় ১১টি বালখিল্য সূক্তকে ঋক্‌সংহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভেদে প্রচলিত শাখাগুলি অধুনা লুপ্ত হয়েছে।

দশটি মণ্ডলে বিভক্ত ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় থেকে অষ্টম এই সাতটি মণ্ডলের সাতটি ঋষিকুলের শ্রুতিরক্ষিত মন্ত্ররাশি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই সাত জন ঋষি হলেন যথাক্রমে—গৃৎসমদ (২য় মণ্ডল), বিশ্বামিত্র (৩য়ঃ মঃ), বামদেব (৪র্থ), অত্রি (৫মঃ), ভরদ্বাজ (৬ষ্ঠ), বশিষ্ঠ (৭ম) এবং কণ্ব (৮মঃ)। এই মণ্ডলগুলিকে তাই বলা হয়—'Family Books' বা গোষ্ঠীমণ্ডল। বিভিন্ন ঋষির দ্বারা দৃষ্ট সোমদেবতার প্রশস্তিসূচক সূক্ত স্থান পেয়েছে নবম মণ্ডলে। প্রথম ও দশম মণ্ডলের সূক্তগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।

প্রথম মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা ১৯১। মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, কণ্ব, গোতম, কুৎস প্রভৃতি এই মণ্ডলের প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে গায়ত্রী ছন্দে রচিত, এর ঋষি বৈশ্বামিত্র মধুচ্ছন্দা। এই মণ্ডলেই আছে ঋষি কাণ্ব মেধাতিথি দৃষ্ট প্রখ্যাত বৈষ্ণবী ঋক্—

"ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে"।। (১/২২/১৭)

কিছু কিছু ঋক্‌মন্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে ঋষিকবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ঐকান্তিক মর্ত্যব্যাকুলতা। যেমন—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্তোষধীঃ।।" ইত্যাদি (১/৯০/৬)

দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ সূক্তও পাওয়া যায় এই মণ্ডলে। এই মন্ত্রটিতে বহুত্বের অন্তরালে একেশ্বরবাদ উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গুরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।" (১/১৬৪/৪৬)

দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা ৩৯। প্রসিদ্ধ সজনীয় সূক্ত (২/১২/১) বা ইন্দ্র সূক্ত এই মণ্ডলের অন্তর্গত। মোট ১৫টি ঋকের মধ্যে প্রথম চৌদ্দটির শেষে আছে এই বাক্যটি—"স জনাস ইন্দ্রঃ"। ইন্দ্র ছাড়াও এই মণ্ডলে স্তুত হয়েছেন—রুদ্র, আদিত্য, বরুণ, ব্রহ্মণস্পতি, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ প্রভৃতি দেবতা। **তৃতীয় মণ্ডলে** মোট ৬২টি সূক্ত আছে। এই মণ্ডলের সর্বশেষ সূক্তে আছে প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি—

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।। (৩/৬২/১০)

চতুর্থ মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা ৫৮ যার অধিকাংশেরই দ্রষ্টা ঋষি বামদেব। এই মণ্ডলের একটি মন্ত্রে পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে—

"হংস শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।। (৪/৪০/৫)

এই মণ্ডলে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, ঊষা, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। **পঞ্চম মণ্ডলে** ৮৭টি সূক্ত আছে। এই মণ্ডলের 'নারাশংসী' সূক্তগুলিতে কর্মযোগী মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে। মহিলা ঋষি বিশ্ববারা কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রগুলিতে নারীর সৌভাগ্যকামনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। **ষষ্ঠ মণ্ডলের** সূক্ত সংখ্যা ৭৫। অগ্নি, ইন্দ্র ছাড়াও এখানে মরুদ্‌গণ, পুষা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিদ্বয়, বৃহস্পতি, সরস্বতী, সোম, রুদ্র, দ্যাবাপৃথিবী, সবিতা প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য ঋষিদের আকুল প্রার্থনা পরিলক্ষিত হয়। **সপ্তম মণ্ডলে** মোট ১০৪টি সূক্ত আছে। এই মণ্ডলের পর্জন্যসূক্ত (৭/১০১) এবং ভেকসূক্ত (৭/১০৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টিকাম ব্যক্তি এই সূক্ত জপ করেন। এখানে নববর্ষার আনন্দে উৎফুল্ল ভেকের শব্দকে অতিরাত্র নামক সোমযাগে স্তোতৃবর্গের উচ্চারিত স্তুতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

"ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে সরো ন পূর্ণমভিতো বদন্তঃ।
সম্বৎসরস্য তদহঃ পরিষ্ঠ যন্মণ্ডুকাঃ প্রবৃষীণং বভূব।।" (৭/১০৩/৭)।।

অষ্টম মণ্ডলে মূলতঃ প্রগাথগোত্রীয় ঋষিদের মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। তাই এই মণ্ডলটি প্রগাথমণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ। এই মণ্ডলেই আছে ১১টি বালখিল্য সূক্ত। **নবম মণ্ডলের** সূক্তসংখ্যা ১১৪। প্রতিটি সূক্তেই পবমান সোমের স্তুতি করা হয়েছে। একটি ঋকে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রবহমান সোমরসকে দুগ্ধদায়িনী গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—"প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবোঽসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ" (৯/৬৮/১)। অপর একটি সূক্তে সোমপানের দ্বারা ইন্দ্রের বলাধানের কথা বলা হয়েছে—

"শর্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্ বীর্যং মহদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।" (৯/১১৩/১)

দশম মণ্ডলে বিভিন্ন ঋষি-দৃষ্ট ১৯১টি সূক্ত সংকলিত হয়েছে। অনেকে এই মণ্ডলটিকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করেন। ঘোষা, যমী, পৌলোমী, ইন্দ্রাণী, আম্ভৃণী বাক্ প্রভৃতি ব্রহ্মবিদুষী মহিলা-ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট সূক্ত এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানেই সর্বপ্রথম গঙ্গার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়— "ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পুরুষ্যা" (১০/৭৫/৫)। দশমমণ্ডলের বিখ্যাত পুরুষসূক্তে (সূক্তসংখ্যা-৯০)

সর্বপ্রথম চতুর্বর্ণের নাম উল্লিখিত হয়েছে—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।। (১০/৯০/১২)

ঋক্‌সংহিতার এই মণ্ডলটি বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে যেমন ভাবগম্ভীর বহু দার্শনিক চিন্তামূলক সূক্ত আছে, তেমনি আছে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত। বিখ্যাত কিছু সংবাদসূক্তও এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কয়েকটি সূক্তে প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের ধ্যানধারণা। দশম মণ্ডলের শেষ সূক্তের শেষ মন্ত্রটি সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রার্থনায় সমুজ্জ্বল—

"সমানী ব আকূতিঃ সামানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।" (১০/১৯১/৪)

বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিমূলক ঋক্‌মন্ত্রগুলি কল্পনার মাধুর্যে, কাব্যধর্মের শিল্পিত সুষমায় এবং রসোচ্ছলতায় অপরূপ। কিছু কিছু সূক্ত আবার গীতিময়তায় সমৃদ্ধ। ভিন্তারনিৎস তাই বলেছেন—"Some pearls of lyric poetry, which appeal to us as much through their fine comprehension of the beauties of nature, as through their flowery language are to be found among the songs of Sūrya, Parjanya, Marutas and above all to Usas".[১]

ঋগ্বেদের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত (Secular hymns)

ঋগ্বেদে প্রধানতঃ বিভিন্ন দেবতার স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এই বেদ মূলতঃ দেবস্তুতিমূলক এবং ধর্মমূলক হলেও এখানে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সূক্ত আছে যেগুলিতে দেবতা বিষয়ক ভাবনা মুখ্য স্থান লাভ করে নি। ধর্মের সঙ্গে এই সূক্ত গুলির কোন সংশ্রব নেই। ধর্মমূলক সূক্তের তুলনায় এই জাতীয় সূক্তের সংখ্যা অল্প হলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে এদের মূল্য অপরিসীম। ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই বলে এই সূক্তগুলিকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত। এই জাতীয় সূক্তের মধ্যে একদিকে যেমন আছে বিভিন্ন নীতিমূলক সূক্ত, নারাশংসী, দানস্তুতি প্রভৃতি; অপরদিকে তেমনি আছে সংবাদসূক্ত, সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক সূক্ত প্রভৃতি। ইন্দ্রজালমূলক কতিপয় সূক্তও ঋগ্বেদে পরিলক্ষিত হয়। এইজাতীয় সূক্তগুলিও ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত। তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিন্তাধারা, সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানার পক্ষে এই সূক্তসমূহের মূল্য অপরিসীম।

ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত হেঁয়ালীতে ভরা। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অষ্টম মণ্ডলের ২৯ সংখ্যক সূক্ত। কোন দেবতার উল্লেখ না করে এখানে অনেক দেবতার গুণ কীর্তিত হয়েছে। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সংখ্যক সূক্তের ৫২টি মন্ত্রই গভীর রহস্যে আবৃত।

সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সংখ্যক সূক্তটি ভেকসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তের একটি মন্ত্রে বর্ষাসমাগমে উৎফুল্ল ভেকদিগের রবকে বৎসলাভকারী ধেনুদের রবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

"দিব্যা আপো অভি যদেনমায়ন্দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম্।
গবামহ ন মায়ুর্বৎসিনীনাং মণ্ডূকানাং বগ্নুরত্রা সমেতি।।[১]"

অপর একটি মন্ত্রে (৭/১০৩/৭) ভেকের শব্দকে অতিরাত্র নামক সোমযাগে স্তোতৃবর্গের উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অন্যান্য ঋক্‌গুলিতেও আছে ভেকেদের শব্দের নানান উপমা। অধ্যাপক ব্লুমফিল্ড (Bloomfield)-এর মতে ইন্দ্রজালমূলক এই সূক্তটিতে বৃষ্টির জন্যই ভেকগণকে আহ্বান করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রজালাত্মক সূক্তের সংখ্যা প্রায় তিরিশটি। এর কোনটি রোগ নিরাময়ের জন্য, অশুভ প্রভাব দূরীকরণের জন্য রচিত, কোনটি বা শত্রুনাশের জন্য রচিত। এমন কি বিষের প্রভাব দূর করার জন্য, শস্যোৎপাদনের জন্য, নিদ্রাকর্ষণের জন্য এবং যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ব্যবহৃত কিছু মন্ত্রও পাওয়া যায়। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সংখ্যক সূক্তে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও আনুষঙ্গিক আয়োজনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যোদ্ধার বর্ম, মৃগশৃঙ্গ-নির্মিত তীরের ফলা, গরুর স্নায়ুনির্মিত জ্যা, রথ ও অশ্বের কার্যকারিতা প্রভৃতি উপমাগর্ভ বর্ণনাই এই সূক্তের মূল বিষয়। এই সূক্তের শেষ ঋকটি আবার জ্ঞাতিশত্রুতার পরিচয়বাহী এবং অনিষ্টকারী জ্ঞাতিদের প্রতি অভিশম্পাত স্বরূপ—

"যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্।।[২]

ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির মধ্যে নীতিমূলক কয়েকটি সূক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবম মণ্ডলের ১১২ সংখ্যক সূক্তে পার্থিব বিভিন্ন বস্তু লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। দশম মণ্ডলের ৭১ সংখ্যক সূক্তে ভাষাশিক্ষার প্রথম পাঠের ইঙ্গিত এবং জ্ঞানগর্ভ বাক্যের প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়। দশমমণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তে দানের মূল্য সম্পর্কে নীতিমূলক মন্ত্র আছে। এই শ্রেণীর নীতিপ্রতিপাদক সূক্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সূক্ত হল অক্ষসূক্ত (১০/৩৪)। অক্ষক্রীড়াসক্ত এক হতভাগ্যের করুণ বিলাপ এই সূক্তের মূল বিষয়। অক্ষক্রীড়ার প্রতি দুর্নিবার আসক্তিবশতঃ সে সর্বস্বান্ত হয়েও অক্ষক্রীড়ার আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারে নি। পরিবারের সকলে এবং আত্মীয়স্বজন তাকে ত্যাগ করেছে, তাকে অপরের বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে হয়। অবশেষে অনুতপ্ত জুয়াড়ী তার ভুল বুঝতে

১. ঋ. সং. ৭/১০৩/২.

পেরে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করেছে। তাই বলা হয়েছে—"অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।"[১]

ধর্ম নিরপেক্ষ আর একটি বিখ্যাত সূক্ত হল দশম মণ্ডলের বিবাহ বিষয়ক সূক্ত (১০/৮৫)। এখানে সোমের সঙ্গে সূর্যকন্যা সূর্যার বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। কিছু মন্ত্রে বিবাহের আচার-আচরণ, আবার কিছু মন্ত্রে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি উপদেশবাক্য পরিলক্ষিত হয়। শেষ ঋক্‌টিতে উচ্চারিত হয়েছে বর ও বধূর সম্মিলিত প্রার্থনা—

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।।[২]

প্রাচীন ভারতের বিবাহ পদ্ধতির অনেক তথ্য এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। দশম মণ্ডলের ১৮ সংখ্যক সূক্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রীতিনীতি, ১৪ সংখ্যক সূক্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উচ্চার্য মন্ত্র ও পারলৌকিক সুখ, ১৫ সংখ্যক সূক্তে পিতৃলোক, ৩৩-সংখ্যক সূক্তে আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হয়েছে। এই মণ্ডলের ১৪৬-সংখ্যক সূক্তের অরণ্যানীর বর্ণনা বাস্তবোচিত ও কাব্যধর্মী। নবম মণ্ডলের ১১২-সংখ্যক সূক্তে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র-পেশার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে—

"নানানং বা উ নো ধিয়ো ব্রানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগব্রহ্মা সুম্নমিচ্ছন্তীদ্রায়েন্দো পরিস্রব।।[৩]"

কতকগুলি সূক্তে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য। সৃষ্টির উদ্ভব ও প্রক্রিয়াকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করে রচিত এই সকল সূক্তকেও ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দশম মণ্ডলের ৭২ সংখ্যক সূক্তে প্রতিভাসিত হয়েছে অসৎ থেকে সতের বিবর্তন। সৃষ্টি রহস্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে (১০/৯০), হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (১০/১২১) এবং নাসদীয় সূক্তে (১০/১২৯)।

নারাশংসী এবং দানস্তুতি জাতীয় সূক্তগুলিকেও ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের শ্রেণীতে ফেলা যায়। ধনী রাজন্যবর্গের যজ্ঞে ঋত্বিকের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ঋষিরা প্রভূত দক্ষিণা লাভ করতেন। যজমানের দাক্ষিণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে ঋষিরা সেই দানের যেমন প্রশংসা করতেন, তেমনি দাতারও প্রশংসা করতেন। দাতার স্তুতিমূলক সূক্ত গুলিকে বলা হয় 'নারাশংসী', আর দানের প্রশংসাসূচক সূক্তসমূহকে বলা হয় 'দানস্তুতি'। দশমমণ্ডলের ১০৭ এবং ১১৭ সংখ্যক সূক্ত এই জাতীয় রচনা। কতকগুলি ঐতিহাসিক নাম এবং ঘটনার উল্লেখ থাকায় সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।

১. ঋ. সং. ১০/৩৪/১৩
২. ঋ. সং. ১০/৮৫/৪৭

কথোপকথনের আকারে রচিত ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্তগুলি ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ (১০/১০), সরমা-পণি সূক্ত (১০/১০৮), অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কথোপকথন (১/১৭৯) প্রভৃতি। দশম মণ্ডলের ৫১ এবং ৫২ সংখ্যক সূক্তে অগ্নি এবং দেবগণের মধ্যে কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদে প্রায় কুড়িটি এই জাতীয় সূক্ত আছে। ওল্ডেনবার্গ (Oldenberg) মহোদয় এই সংবাদসূক্তগুলিকে 'আখ্যানসূক্ত' নামে অভিহিত করেছেন। ম্যাক্সমূলর এবং সিলভ্যাঁ লেভির মতে এই জাতীয় সূক্তগুলি একধরণের নাটক।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির অবদান অপরিসীম। পণ্ডিতেরা একদিকে যেমন পরবর্তীকালের সংস্কৃত মহাকাব্যের সঙ্গে এগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নাটকের আদি উৎস বলেও এগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ এই সূক্তগুলির বর্ণনারীতি পরবর্তীকালে মহাকাব্যে অনুসৃত হয়েছে। কথোপকথনমূলক সংবাদসূক্তগুলি সংস্কৃত নাটকের সংলাপ রচনায় অনুসৃত হয়েছে। ওল্ডেনবার্গ এগুলিকে গাথাজাতীয় মহাকাব্য রচনার উৎস বলে অভিহিত করেছেন। ভিন্তারনিৎস-এর মতে প্রাচীন গাথাজাতীয় রচনাগুলি মহাকাব্য এবং নাটক উভয় শ্রেণীর রচনারই উৎস—"This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama."[১]। ঋগ্বেদের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তসমূহে কবিত্বের যে নিদর্শন আছে তা পরবর্তীকালের মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে যে নাট্যরচনার বীজ নিহিত আছে সেকথাও সত্য। সুতরাং বলা যায়—বৈদিক সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তে বিশেষ করে সংবাদ সূক্তের মধ্যে মহাকাব্য ও নাট্য রচনার যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তা লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানবসভ্যতার প্রারম্ভিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সূক্তগুলির অবদানও অনস্বীকার্য।

ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত (Dialogue hymns)

ঋগ্বেদ মূলতঃ ধর্মমূলক গ্রন্থ হলেও ঋক্‌সংহিতায় প্রায় কুড়িটি সূক্ত পাওয়া যায় যেগুলি কথোপকথনের আকারে রচিত। এই সূক্তগুলির কোনটিই দেবতার স্তুতিমূলক নয়। তৎকালীন ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে এই সূক্তগুলি স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। এদের রচনারীতিও অন্যান্য সূক্ত অপেক্ষা স্বতন্ত্র। পারস্পরিক কথোপকথনের আকারে রচিত এই সূক্ত সমূহকে সংবাদসূক্ত নামে অভিহিত করা হয়।

ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সংখ্যক সূক্ত, দশম মণ্ডলের ১০, ৫১, ৫২, ৮৬, ৯৫, ১০৮ সংখ্যক সূক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সংখ্যক সূক্তটি অগস্ত্য ও তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রার কথোপকথনাত্মক। দশম মণ্ডলের

১০ সংখ্যক সূক্তটি বিখ্যাত যম-যমী সংবাদ। সৃষ্টির প্রারম্ভে নির্জন স্থানে কামাতুরা যমী কামোদ্দীপক ভাষায় তার ভ্রাতা যমের সঙ্গে দৈহিক মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যমকে অবৈধ মিলনে প্রবৃত্ত হবার জন্য যমী বলছে—

"ও চিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমাদধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ।।১"

কিন্তু সংযমী যম ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন যে অবৈধ তা যমীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই অন্যায় কামনা থেকে তাকে নিবৃত্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছে। সে অন্য পুরুষকে বরণ করার জন্য যমীকে বলেছে—

"অন্যমূ ষু ত্বং যম্যা উ ত্বাং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃনুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্।।২

মাঝপথে এভাবে সমাপ্ত এই আখ্যানটির পরিণতি বা প্রভাব পরবর্তী কোন সাহিত্যে অনুপস্থিত। ভিন্টারনিৎস মনে করেন যে, সম্ভবতঃ যমজ স্ত্রী-পুরুষ থেকে মানবজাতির উদ্ভবের কোন প্রাচীন উপাখ্যান নিহিত আছে এই সংবাদসূক্তটির মধ্যে—"An old myth of the origin of the human race from a first pair of twins underlies the conversation."৩ অনেকের মতে এই সংবাদসূক্তটি রূপকাত্মক। যম যমী যথাক্রমে দিবা ও রাত্রির প্রতীক। রাত্রি দিবার পশ্চাতে এলেও তাদের কখনো সঙ্গমন হয় না। বাইবেলে বর্ণিত আদম ও ইভের পুত্রকন্যার মধ্যে অবৈধ বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনের কাহিনীর সঙ্গে যম-সমীসংবাদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

দশম মণ্ডলের ৫১ ও ৫২ সংখ্যক সূক্তের বিষয়বস্তু অগ্নি এবং দেবতাদের কথোপকথন। দেবতাদের হবিঃ বহনে উদ্যত হয়ে অগ্নি জলের মধ্যে আত্মগোপন করেন। অবশেষে দেবতারা অগ্নিকে হবির্ভাগ এবং দীর্ঘ পরমায়ু দানের আশ্বাস দেন—

"তব প্রযাজা অনুযাজাশ্চ কেবল উর্জস্বন্তো হবিষঃ সন্তু ভাগাঃ।
তবাগ্নেঃ যজ্ঞোঽয়মস্তু সর্বস্তভ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রঃ।।৪

দেবতাদের কাছ থেকে আশ্বাস লাভের পর অগ্নি পুনরায় হবির্বহনের কাজে ব্রতী হন। দশম মণ্ডলের ৮৬ সংখ্যক সূক্তের ২৩টি মন্ত্রে ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপির মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রের শেষেই ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—"বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ"। মনে হয় সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পুরূরবা ও উর্বশীর কথোপকথনাত্মক সংবাদসূক্তটি (১০/৯৫) সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। সূক্তটি আঠারোটি মন্ত্রে নিবদ্ধ। মর্ত্যের রাজা পুরূরবা স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে চার বৎসর তাঁর সঙ্গসুখে অতিবাহিত করেন। গর্ভবতী উর্বশী একদিন অন্তর্হিত হন। উন্মত্তপ্রায় পুরূরবা প্রিয়তমার অন্বেষণে বেরিয়ে কোন এক সরোবরে অপ্সরাপরিবৃত উর্বশীকে বিহার করতে দেখেন। এখানে উভয়ের কথোপকথনই এই সূক্তের মূল বিষয়বস্তু। উর্বশীর বিরহে পুরূরবা প্রাণত্যাগে উদ্যত হলে উর্বশী তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য বললেন—

"পুরূরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকানাং হৃদয়ান্যেতা।।"১

ঋগ্বেদে কীর্তিত এই কাহিনীটি শতপথব্রাহ্মণে (১১.৫.১) গদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে এবং কথাসরিৎসাগরেও এই আখ্যান পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় কবিমানসে এই সূক্তটির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের উপজীব্য কথাবস্তুও এই সংবাদসূক্ত থেকে আহৃত। সূক্তটি কাব্যগুণে এবং নাটকীয় সৌন্দর্যে উজ্জ্বল।

দশম মণ্ডলের ১০৮ সংখ্যক সূক্ত সংবাদসূক্তের আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সূক্তের এগারোটি মন্ত্রে দেবলোকের কুকুরী সরমা এবং পণিগণের উক্তিপ্রত্যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। পণিনামক দস্যুরা ইন্দ্রের গাভীগুলি অপহরণ করে পর্বতবেষ্টিত এক দূরবর্তী স্থানে আত্মগোপন করেছিল। কুকুরী সরমাকে ইন্দ্র দূতীরূপে গাভীর অন্বেষণে প্রেরণ করেন। বহু বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে সরমা পণিদের সন্ধান পায় এবং তাদের গোধন-প্রত্যর্পণ করার কথা বলে—"ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্ বঃ।"২ পণিরা নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে সরমাকে সেখানেই থেকে যেতে বলল। কিন্তু সরমা সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে বলল—

"নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিন্দ্রো বিদুরঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্ যদায়মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ।।"৩

অর্থাৎ আমি ভাই বা ভগিনী সম্বোধন বুঝি না, ইন্দ্র ও অঙ্গিরার সন্তানেরা গোধন সংগ্রহের জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন; তোমরা আত্মরক্ষার জন্য দূরে পলায়ন কর। ইউরোপীয় পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মতে এই বৈদিক উপাখ্যানটি প্রাতঃকালীন প্রকৃতির একটি উপমা মাত্র। সরমা হলেন ঊষা, দেবগণের গাভী হল সূর্যরশ্মি। প্রাতঃকালে ঊষার দ্বারা আলোক উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমার দ্বারা গাভী উদ্ধার রূপে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলিকে 'আখ্যানসূক্ত' নামে চিহ্নিত করে এগুলিকে গাথাজাতীয় রচনা বলেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন মহাকাব্য ছিল গাথাজাতীয় রচনা। এতে গদ্যের সঙ্গে পদ্যের সংমিশ্রণ থাকত। উক্তিপ্রত্যুক্তিগুলি রচিত হয় পদ্যে, গদ্যের সাহায্যে তাদের মধ্যে যোগসূত্র রচিত হত। ওল্ডেনবার্গের এই অভিমত উল্লেখ করে ভিন্টারনিৎস বলেছেন—"The oldest form of epic poetry in India, he said, was a mixture of prose and verse, the speeches of the persons only being in verses, while the events connected with the speeches were narrated in prose."[১] কিন্তু ওল্ডেনবার্গের এই অভিমত সকলে স্বীকার করেন নি। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার এবং ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির মতে ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলি নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। হার্টেল, শ্রোয়েডর, ম্যাক্‌ডোন্যাল প্রভৃতি পণ্ডিতও এই মতের সমর্থক। এঁদের মতে এই সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে নিহিত আছে সংস্কৃত নাটকের বীজ। ঋগ্বেদের কালে এগুলি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাটকীয় ক্রিয়াকলাপরূপে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এগুলির অনুকরণে সংস্কৃত নাটক রচিত হয়।

ভিন্টারনিৎস এবিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি পরস্পর বিরোধী এই দুই মতের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেছেন—"This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama, for these ballads consist of a narrative and of a dramatic element."[২] অর্থাৎ এই প্রাচীন গাথাজাতীয় রচনাগুলি মহাকাব্য এবং নাটক উভয় শ্রেণীর রচনার উৎস। এগুলির মধ্যে একদিকে যেমন আছে বর্ণনাত্মক রচনারীতি, অপরদিকে তেমনি আছে নাটকীয় রচনাভঙ্গী। পরবর্তীকালে এই বর্ণনাত্মক রীতি থেকে মহাকাব্যের এবং নাটকীয় রচনাশৈলী থেকে নাটকের উৎপত্তি ঘটেছে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এই জাতীয় রচনা। মহাভারত, পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্যে এ ধরণের কথোপকথনমূলক রচনা পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় রচনায় মহাকাব্যের রচনাবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে আছে নাটকীয় লক্ষণ। সুতরাং ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলি অংশত মহাকাব্যধর্মী এবং অংশত নাট্যধর্মী।

ঋক্‌সংহিতার পরবর্তী বাঙ্‌ময়েও সংবাদসূক্তের প্রভাব স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ বা উপনিষদেও এজাতীয় রচনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'ইন্দ্ররোহিত সংবাদ' (৩৩/৪), কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদ (১/১), বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ' (৪/৪) এই জাতীয় রচনার উদাহরণ।

ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্ত (Philosophical hymns)

ঋগ্বেদে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের তুলায় ধর্মসংক্রান্ত এবং দার্শনিক ভাবধারায় পুষ্ট সূক্তের সংখ্যা অনেক বেশী। এই সকল সূক্তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ঋষি-কবিদের মনন ও চিন্তার

বিচিত্র প্রকাশ। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি প্রার্থনামূলক বা দেবস্তুতিমূলক হলেও কতকগুলি সূক্তে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উন্নততর চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্ম, জগৎ ও জীবন, সৃষ্টিরহস্য, একেশ্বরবাদ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর চিন্তা নিয়ে রচিত সূক্তসমূহকে দার্শনিক সূক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়।

দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ সূক্তের অধিকাংশই পরিলক্ষিত হয় ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে। ঋগ্বেদে বহু দেবতা স্তুত হলেও বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত দেবতারা বস্তুতঃ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরম সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। এই চরম সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে ঋগ্বেদের একটি বহুবিশ্রুত মন্ত্রে—"একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"[১] দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ইন্দ্রসূক্তে (সূক্ত সংখ্যা-১২) যেখানে প্রতিটি মন্ত্রে ইন্দ্রের সর্বাতিশায়ী মহিমা প্রতিপাদিত হয়েছে—"স জনাস ইন্দ্রঃ।" ঋষি-কবির কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—

"যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্নস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ।।"[২]

জন্মমাত্রেই তিনি মনস্বীদের অগ্রগণ্য রূপে বিদিত। কর্মের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তাঁর মহত্বে স্বর্গ ও পৃথিবী অভিভূত। ইন্দ্রের এই মহত্ত্ব কীর্তনের অন্তরালে নিহিত আছে সেই সর্বব্যাপী পরম সত্তার ধারণা।

দশম মণ্ডলের হিরণ্যগর্ভ সূক্ত (সংখ্যা-১২১) দার্শনিক সূক্তসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহুদেবতার অস্তিত্বে সন্দিহান ঋষি এই সূক্তে হিরণ্যগর্ভকেই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।"[৩] প্রথম নয়টি মন্ত্রের শেষ পংক্তিতে "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—এই আপাতসরল প্রশ্নের অন্তরালে দেবতার অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকের মতে 'ক'-শব্দ দ্বারা এখানে হিরণ্যগর্ভ নামক সৃষ্টিকর্তার অনুভব প্রকাশিত হয়েছে। এই হিরণ্যগর্ভই ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে পরম পুরুষরূপে, জগতের একমাত্র অধীশ্বররূপে কীর্তিত হয়েছেন।

ঋগ্বেদের বহু আলোচিত দার্শনিক সূক্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল পুরুষ সূক্ত (১০/৯০), দেবীসূক্ত (১০/১২৫) এবং রাত্রিসূক্ত (১০/১২৭)। পুরুষসূক্তে জগৎস্রষ্টার বিশ্বব্যাপী রূপের আভাস স্পষ্ট। সৃষ্টির সূচনায় পুরুষ কিভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন, কিভাবে সেই একক সত্তা স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হল তার কাব্যধর্মী বর্ণনা

আছে এই সূক্তে। জগতের যা কিছু সৃষ্টপদার্থ সবই এই পুরুষ—"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" তাঁর মন থেকে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ থেকে বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে—

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত।।"[১]

তিনি বিশ্বময় হয়েও বিশ্বাতীত। পুরুষসূক্তের এই তত্ত্বই পরবর্তী উপনিষদে পল্লবিত হয়েছে। দেবীসূক্তে অম্ভৃণী ঋষির কন্যা বাক্‌দেবী ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে নিজেকেই সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলে ঘোষণা করেছেন—

"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামুং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি।।"[২]

অর্থাৎ তিনিই আকাশকে প্রসব করেছেন যে আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রের জলে তাঁর স্থান, সেখানে থেকে তিনি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হন। নিজের সমুন্নত দেহদ্বারা তিনি দ্যুলোককেও স্পর্শ করে থাকেন। উপনিষদে ব্রহ্মকে যে বিশ্বের উৎস, বিশ্বময় ও বিশ্বাতীগ রূপে কীর্তিত করা হয়েছে তার বীজ নিহিত আছে এই সূক্তটিতে। রাত্রিসূক্তে রাত্রির রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেবীরূপিনী মহাশক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। দেবীস্বরূপিণী রাত্রি সকলকে আচ্ছন্ন করেই বিরাজমান। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নাশ করেছেন। তাই বলা হয়েছে—

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।।"[৩]

এই আলোকের দ্বারা অন্ধকার নাশ বস্তুতঃ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞতারূপ তমিস্রারই বিনাশ।

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে (১০/১২৯) পরমাত্মার স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। সূক্তটিতে বৈদিক ঋষিদের সৃষ্টি বিষয়ক ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে এই মন্ত্রে—

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধানান্ন পরঃ কিং চনাস।"[৪]

সৃষ্টির পূর্বে সৎ-অসৎ, মৃত্যু-অমৃতত্ব, দিন-রাত্রি কোন কিছুই ছিল না। সমস্ত স্থান ছিল অন্ধকার ও জলে আচ্ছন্ন। বৈদিক ঋষির এই অনুভূতিতে ফুটে উঠেছে সর্বব্যাপী

১. ঋ. সং-১০/৯০/১৩
২. ঋ. সং-১০/১২৫/৭
৩. ঋ. সং-১০/১২৭/২

এক মহাশূন্যতার চিত্র—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নো ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য সর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।।"[১]

পৃথিবীর এই অব্যক্ত অবস্থা ধরা পড়েছিল ঋষির অনুভূতিতে। প্রকৃতির যে সৌন্দর্যকে ঋষিরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন তা কার্যমাত্র। তাহলে প্রশ্ন হল—আদি কারণ কে? কিন্তু এই চরম রহস্যের উত্তর দেওয়া যে মানুষের সাধ্য নয় তা ঋষি স্বীকার করেছেন। সেই পরম সত্যকে বোঝার অক্ষমতা ঋষির অন্তরে এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের আকার ধারণ করেছে—

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ
কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনে-
নাথা কো বেদ যত আবভূব।।"[২]

বৈদিক ঋষিরা চিরকাল সৃষ্টির রহস্য জানার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। ক্রমে সত্যদর্শনের দ্বারা তাঁদের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়েছে অসৎ থেকে সৎ-এর উৎপত্তির রহস্য। নাসদীয় সূক্তে সেই তত্ত্বোপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে।

দশম মণ্ডলের অঘমর্ষণ সূক্তটিও (১০/১৯০) দার্শনিক সূক্তের অন্তর্গত। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই সূক্তে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে ঋত ও সত্য, পরে রাত্রি ও সমুদ্রের উদ্ভব হয়েছে। এই সমুদ্র থেকে সংবৎসর সৃষ্টি হয়েছে। এরপর যথাকালে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, স্বর্গ, মর্ত্য এবং আকাশ সৃষ্টি হয়েছে—

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথ স্বঃ।[৩]

বীজাকারে নিহিত এই দার্শনিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উপনিষদে পল্লবিত হয়েছে। এই সূক্তগুলিতে একদিকে যেমন সৃষ্টি বিষয়ে আর্য ঋষিদের ধ্যানধারণা প্রকাশিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি বহুর মধ্যে একের, বহুদেবতার মধ্যে একক মহাসত্তার আভাস অভিব্যক্ত হয়েছে। সংহিতোত্তর যুগে একেশ্বরবাদের যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বীজ নিহিত আছে ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্তসমূহে। অধ্যাপক ভিন্তারনিৎস তাই মন্তব্য করেছেন—".....there are about a dozen of hymns in the Rgveda which we can designate as Philosophical hymns, in which, along with speculations on the universe, and the creation, the great pantheistic

১. ঋ. সং-১০/১২৯/১
২. ঋ. সং-১০/১২৯/৬

idea of the Universal Soul which is one with the universe, appears for the first time–an idea, which since that time has dominated the whole of Indian Philosophy."[১]

ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্তের পরমাত্মা ও জগৎসৃষ্টি বিষয়ক সর্বেশ্বরবাদী ধারণা ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি ছত্রে অনুরণিত হয়েছে এবং আবহমান কাল ধরে তা ভারতীয় দর্শনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে।

সামবেদ সংহিতা

'সাম' শব্দের অর্থ গান বা গীতি। সুরসংযোগে ঋক্‌মন্ত্র গীত হলেই তাকে সামমন্ত্র বলা হয়। সুতরাং সামবেদ হল গেয় বেদ। ঋগ্বেদের পাদবদ্ধ ছন্দোগুলিতে সুর সংযোগ করলেই তা সামে পরিণত হয়। তাই আচার্য সায়ণ সামবেদ ভাষ্যভূমিকায় বলেছেন—"গীয়মানস্য সাম্নঃ আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে।" ঋক্‌মন্ত্রে সাতটি স্বর প্রয়োগ করে বিভিন্ন সুরে বাদ্যযন্ত্র সহ গান করা হত। এই গেয় মন্ত্রগুলি 'সাম' আখ্যা লাভ করেছে। সায়ণের ভাষায়—"গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি।" সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সামবেদের মোট ১৮১০টি মন্ত্রের মধ্যে ৭৫টি বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত মন্ত্রই ঋক্‌মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি। অনেকের মতে সামবেদের মোট মন্ত্রসংখ্যা ১৫৪৯। ঋক্‌মন্ত্রসমূহ সামবেদে সংকলিত হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি গানরহিত, সামবেদের মন্ত্রগুলি গীতিময়। সামবেদ মূলতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানে গানের জন্যই নির্দিষ্ট। এই সকল মন্ত্রের দ্বারা উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিক এবং তাঁর সহকারীগণ দেবতার স্তুতিগান করেন। এভাবে গানের সঙ্গে উচ্চারিত স্তুতিকে বলা হয় স্তোত্র—"প্রগীতমন্ত্রসাধ্যা স্তুতিঃ স্তোত্রম্।"

দেশ ও কালভেদে সামবেদের অনেক শাখা ছিল। বিষ্ণুপুরাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সামবেদের সহস্র শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। সামবেদজ্ঞ সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে সামবেদের মাত্র ১৩টি শাখার নাম জানা যায়। বর্তমান এই বেদের মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া যায়—রাণায়নীয়, কৌথুমী ও জৈমিনীয়। এরমধ্যে কৌথুমী শাখাই বর্তমানে প্রসিদ্ধ। এই শাখায় উপলভ্যমান সামবেদ সংহিতা দুটি ভাগে বিভক্ত—আর্চিক ও উত্তরার্চিক। ঋক্ ও গানের সংগ্রহকে বলা হয় আর্চিক। এই অংশটি পূর্বার্চিক নামেও প্রসিদ্ধ। এক একটি আর্চিক ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রতিটি প্রপাঠকে দশটি করে সূক্ত আছে। এই দশটি সূক্তের সংকলন 'দশতি' নামে প্রসিদ্ধ। এরূপ প্রত্যেক প্রাপাঠকে আছে দশটি করে 'দশতি'। 'দশতি' আবার তিনভাগে বিভক্ত—ছন্দঃ, আরণ্যক ও উত্তরা।

উত্তরার্চিক নামক দ্বিতীয় খণ্ডে আছে একুশটি অধ্যায় এবং চারশত সাম। প্রতিটি সামে আছে তিনটি করে ঋক্ এবং প্রতিটি ঋকে আছে ঋগ্বেদের তিনটি করে পদ। কোন

কোন ঋকে আবার তিনের অধিক পদের সন্নিবেশ দেখা যায়। উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলি প্রধান প্রধান যাগের পারম্পর্যানুসারে সাজানো হয়েছে। যেমন—দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষুদ্র। উত্তরার্চিকের আর এক নাম 'গান'। পাদবদ্ধ ঋক্‌মন্ত্রের সুরসহ আবৃত্তিশৈলী হল সামগান। ঋকই সামের উৎপত্তিস্থল। তাই ঋক্‌কে সামের 'যোনি' বলা হয়—"ঋক্ সাম্নাং যোনিঃ।"

আর্চিকের সঙ্গে যুক্ত সামগানের চারটি গ্রন্থ পাওয়া যায়—গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, উহগান ও উহ্যগান। গ্রামে যে সকল সামগান গাওয়া হত সেগুলিকে বলা হয় গ্রামগেয় গান। যে সকল গান গ্রামে নিষিদ্ধ, অরণ্যে নিভৃতে গুরুর কাছে শিক্ষা করতে হত সেগুলির নাম অরণ্যগেয় গান। যজ্ঞে সামগানের যে ক্রম অনুসরণ করতে হয় তার নির্দেশ আছে উহ এবং উহ্য নামক গ্রন্থ দুটিতে। উহে আছে গ্রামগেয় গানের ক্রম, আর উহ্যে আছে অরণ্যগেয় গানের নির্দেশ। গ্রামগেয় গানকে প্রকৃতিগান বা যোনিগান এবং উহ্যগানকে রহস্যগানও বলা হয়। গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্য—এই চারটি গ্রন্থে যথাক্রমে সতের, ছয়, তেইশ ও ছয়টি প্রপাঠক আছে। এগুলির মধ্যে প্রথম তেরটি প্রপাঠকের মন্ত্র অগ্নিদেবতা বিষয়ক, শেষ এগারটি প্রপাঠকের মন্ত্র সোমদেবতা বিষয়ক এবং অবশিষ্ট প্রপাঠকের মন্ত্রসমূহ ইন্দ্রবিষয়ক।

যজ্ঞকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই সামবেদ পৃথকভাবে সঙ্কলিত হয়েছিল। গানের মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যেই সামবেদের মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত। সামবেদে কেবল দেবস্তুতিমূলক মন্ত্রগুলিই সঙ্কলিত হয়েছে। সামগানগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত—হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার ও নিধান। সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্‌দের মতে বৈদিক হিঙ্কার, প্রস্তাব ও উদ্‌গীথ অধুনা প্রচলিত গানের স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের সমতুল্য। সামবেদের সপ্তস্বরই পরবর্তীকালে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ নামক সপ্তসুরে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সামগানই ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎস। কেবলমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়, ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের ইতিহাসেও সামবেদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভিন্তারনিৎস-এর মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"The Sāmaveda Samhitā is not without value for the history of Indian sacrifice and magic, and the gānas attached to it are certainly very important for the history of Indian Music."[১]

যজুর্বেদ সংহিতা

ছন্দোবদ্ধ ঋক্ এবং গীতিময় সাম মন্ত্র ছাড়া অবশিষ্ট বৈদিক মন্ত্রকে বলা হয় 'যজুঃ'। যজুঃসংহিতায় পদ্য ও গদ্য উভয় শ্রেণীর মন্ত্র পাওয়া গেলেও এর পদ্যাত্মক মন্ত্রগুলি ঋক্, গদ্যাত্মক মন্ত্রগুলিই যজুঃসংহিতার নিজস্ব মন্ত্র। জৈমিনি পূর্বমীমাংসাসূত্রে যজুঃমন্ত্রের

লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন—"শেষে যজুঃশব্দঃ।' অর্থাৎ ঋক্ ও সাম ভিন্ন অবশিষ্ট মন্ত্রই যজুঃ। যজ্ঞে ঋক্ মন্ত্র দ্বারা দেবতার আহ্বান করা হয়, সামমন্ত্র দ্বারা দেবতার স্তুতিগান করা হয়, আর যজুর্মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের যাবতীয় কর্ম এবং প্রশংসিত দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয়। সুতরাং যজুর্বেদের সঙ্গে বৈদিক যাগযজ্ঞের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 'যজুঃ' শব্দটি যজ্‌ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। শব্দটির ব্যুৎপত্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকেই সূচিত করে। যজ্ঞানুষ্ঠানের যাবতীয় প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এই বেদে উপনিবদ্ধ। সুতরাং শ্রৌত যাগানুষ্ঠানের জন্য যজুর্বেদের জ্ঞান অপরিহার্য। বায়ুপুরাণের মতে যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই এই সংহিতার নামকরণ হয়েছে যজুঃ—

"যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যজনাদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।।[১]

আবার যজুর্বেদের পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু। যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁর ভূমিকাই মুখ্য। 'অধ্বর' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। যিনি যজ্ঞকে যুক্ত বা সম্পাদিত করেন তাঁকে বলা হয় অধ্বর্যু—"অধ্বরং যুনক্তীতি (অধ্বরর্যুঃ) অধ্বর্যুঃ"।[২] অধ্বর্যু পদের এই বৈশিষ্ট্যও যজ্ঞের সঙ্গে যজুর্বেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূচক। তাই যজুর্বেদের আর এক নাম অধ্বর্যুবেদ বা কর্মবেদ। অধ্যাপক ভিন্তারনিৎস যজুর্বেদকে অধ্বর্যুর প্রার্থনাশাস্ত্র বলে অভিহিত করেছেন—".....the Yajurveda Samhitas are the Prayer books for the Adhvarju Priest."[৩]

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যজুর্বেদের ১০১টি শাখার উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুপুরাণে এই বেদের ২৭টি শাখার কথা বলা হয়েছে—"যজুর্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন্ মহামতিঃ"[৪]। তবে বর্তমানে যজুর্বেদের মাত্র দুটি শাখা পাওয়া যায়—কৃষ্ণযজুর্বেদ এবং শুক্লযজুর্বেদ। কৃষ্ণযর্জুবেদের সংহিতার নাম তৈত্তিরীয়সংহিতা এবং শুক্লযজুর্বেদের সংহিতার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ এবং শুক্ল নামকরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুরাণে কথিত আছে যে, মহর্ষি বেদব্যাস বেদ বিভাজনের পর চারজন শিষ্যকে এক একটি বেদ শিক্ষা দেন। তিনি বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়নের শিষ্যদের মধ্যে এই যজুর্বেদ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে কৃষ্ণ ও শুক্ল রূপ লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্যের অহংকারে ক্রুদ্ধ বৈশম্পায়ন তাঁকে সমস্ত উপদিষ্ট বেদবিদ্যা প্রত্যর্পণ করতে বলেন। গুরুর আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বেদবিদ্যা উদ্‌গীরণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা উদ্‌গীর্ণ বলেই তা কৃষ্ণ। সহাধ্যায়ী ঋষিরা তিত্তিরি পাখীর রূপ ধারণ করে বমনরূপে পরিত্যক্ত সেই বেদবিদ্যা গ্রহন করেছিলেন। তাই যজুর্বেদের এই শাখা তৈত্তিরীয় সংহিতা নামেও পরিচিত।

১. বায়ুপুরাণ-৬০/২২
২. ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা, পৃ-১৪
৩. HIL. Vol. I, P-148
৪. বিষ্ণুপুরাণ—৩/৫

সূর্যদেব বাজীরূপ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই বেদবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। 'বাজ' শব্দের অর্থ সূর্যরশ্মি, 'সনি' শব্দের অর্থ ধনসম্পদ। সূর্যের নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে প্রকাশিত বলে যজুর্বেদের এই সংহিতার শুক্লত্ব এবং এর অপর নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। আবার অনেকের মতে কৃষ্ণযজুর্বেদে অধ্বর্যু এবং হোতার করণীয় কর্তব্য এমনভাবে একত্রে কথিত হয়েছে যে, অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হয় কোন্‌টি কার করণীয়। এভাবে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে বলে এই সংহিতার কৃষ্ণত্ব। পক্ষান্তরে শুক্লযজুর্বেদে কেবল অধ্বর্যুর কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সংহিতার বোধসৌকর্যের জন্য এর নাম শুক্ল।

যজুর্বেদের দুটি শাখার মধ্যে কৃষ্ণযজুর্বেদের প্রাচীনত্ব সর্ববাদীসম্মত। কৃষ্ণযজুর্বেদের সংহিতার নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। এই সংহিতা সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ডে আছে কয়েকটি প্রপাঠক বা প্রশ্ন নামক বিভাগ। প্রতিটি প্রপাঠক বা প্রশ্ন কতকগুলি অনুবাকে বিভক্ত। প্রতিটি অনুবাক আবার কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। সাম্প্রতিক সহ কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার যে সম্পূর্ণ সংহিতা গ্রন্থ পাওয়া যায় তাতে সাতটি কাণ্ড, চুয়াল্লিশটি প্রপাঠক বা প্রশ্ন, ছয়শত চুয়াল্লিশটি অনুবাক এবং ২১৮৪টি মন্ত্র আছে। মন্ত্রগুলি আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—অধ্বর্যুর পঠনীয় মন্ত্র, যজমানের পঠনীয় মন্ত্র এবং হোতার পঠনীয় মন্ত্র। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠেয় দর্শপূর্ণমাস নামক ইষ্টিযাগের বিবরণ এই সংহিতার প্রথম থেকেই বিবৃত হয়েছে। সকল শ্রৌতযজ্ঞের বিবরণ এখানে অনুপস্থিত বলে অনেকে কৃষ্ণযজুর্বেদকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেন।

শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি অনুবাকে এবং প্রতিটি অনুবাক আবার কতকগুলি কণ্ডিকায় বিভক্ত। এই সংহিতার চল্লিশটি অধ্যায়ে আছে ৩০৩টি অনুবাক এবং ১৯১৫টি কণ্ডিকা। দর্শ-পূর্ণমাস নামক ইষ্টিযাগ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রযজ্ঞ, সৌত্রামণীযাগ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিধান প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। তাছাড়া এখানে আছে পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও পিতৃমেধ যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার শেষ অর্থাৎ চত্বারিংশৎ অধ্যায়টি ঈশোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। সংহিতার অন্তর্ভুক্ত এবং মন্ত্রের অঙ্গীভূত বলে ঈশোপনিষদ্‌ই একমাত্র মন্ত্রোপনিষদ্। শুক্লযজুর্বেদের আবার দুটি শাখা—কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন। কাণ্বশাখার উপর সায়ণকৃত ভাষ্য প্রসিদ্ধ। মাধ্যন্দিন শাখার উপর ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন মহীধর।

বৈদিক যজ্ঞে যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যুর করণীয় কর্মের বিস্তৃত নির্দেশ পাওয়া যায় এই বেদে। অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের জন্য নির্দিষ্ট বলে এই বেদ আধ্বর্যব বেদ নামেও প্রসিদ্ধ। এই বেদের মন্ত্রগুলি গদ্যে নিবদ্ধ এবং অতি সংক্ষিপ্ত। যেমন প্রথম মন্ত্রটিতে শমীশাখার উদ্দেশ্যে স্তুতি করা হয়েছে—"ইষে ত্বা। উর্জে ত্বা। বায়বস্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে।" আবার একশব্দাত্মক বা একবর্ণাত্মক মন্ত্র বা মন্ত্রাংশও এই বেদে পাওয়া যায়। যেমন—স্বাহা, স্বধা, বষট্, ওঁ প্রভৃতি। কিছু কিছু স্তুতি বা প্রার্থনামূলক মন্ত্রও এই বেদে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রুদ্রের স্তুতিমূলক 'শতরুদ্রিয়'

মন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বেদ মূলতঃ সাক্ষাৎভাবে যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত এবং যজ্ঞের খুঁটিনাটির বর্ণনায় সমৃদ্ধ হলেও এখানে এমন কিছু কিছু মন্ত্র পাওয়া যায় যেগুলি অথর্ববেদের ইন্দ্রজাল ও অভিচার প্রক্রিয়ামূলক মন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই অধ্যাপক ভিন্তারনিৎস মন্তব্য করেছেন—"Some prayer formulae of the Yajurveda are indeed nothing but magic spells in prose. Even exorcisms and curses, quite similar to those with which we have become acquainted in the Atharvaveda, confront us also among the prayers of the Yajurveda".[১] তবুও ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে প্রার্থনা বা স্তুতির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং তাৎপর্য জানতে হলে যজুর্বেদের স্তুতিগুলিকে জানা একান্ত আবশ্যক। যজুর্বেদের সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞান ভিন্ন উপনিষদের মর্মার্থ অনুধাবন সম্ভব নয়।[২]

বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক তথ্য নিহিত আছে যজুর্বেদে। তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত চতুর্বর্ণ, প্রতিলোম ও অনুলোম বর্ণ, জাতিভেদ, বর্ণভেদে বৃত্তির ব্যবস্থা প্রভৃতির বিভিন্ন তথ্য এই সংহিতায় পাওয়া যায়। শৈবধর্মের উৎপত্তি ও প্রসারের ইতিহাসে শুক্লযজুর্বেদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়টি রুদ্রাধ্যায় নামে অভিহিত। এই অধ্যায়ে পশুপতি, শম্ভু, শিব, শংকর, কৃত্তিবাস, গিরিশ, শিতিকণ্ঠ, কপর্দী প্রভৃতি নামে রুদ্র উল্লিখিত হয়েছেন। যজুর্বেদের কিছু কিছু মন্ত্র আবার কাব্যরসে সমৃদ্ধ, কবিকল্পনায় অনবদ্য এবং ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়।

অথর্ববেদ সংহিতা

অথর্ববেদের প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ'। 'অথর্বন্' শব্দের অর্থ এক শ্রেণীর অগ্নির উপাসক। 'অঙ্গিরা' শব্দের অর্থ অগ্নিযাজক। প্রাচীনকালে এই অগ্নির উপাসক ভারতীয় অথর্বনকে লোকে ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী বলে মনে করত এবং রিষ্টি শান্তি, ব্যাধিনিরাময়, অনাবৃষ্টি নিবারণ প্রভৃতি কাজে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করত। অপরদিকে শত্রুর অনিষ্ট কামনায় মারণ উচাটনাদি অভিচারক্রিয়াকে বলা হত আঙ্গিরস। কালক্রমে শব্দদুটি ইন্দ্রজালসংক্রান্ত বিদ্যাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হত। এই শুভজনক অথর্বন্ এবং অশুভজনক আঙ্গিরস উভয় বিদ্যাই যে বেদে আছে তাকে বলা হয় অথর্বাঙ্গিরসবেদ বা অথর্ববেদ। সুতরাং এই শুভাশুভ ইন্দ্রজাল বিষয়ক মন্ত্রপ্রতিপাদক বেদই অথর্ববেদ—"The old name Atharvāngirasaḥ thus means two kinds of magic formulae which form the chief contents of the Atharvaveda."[৩]

১. *HIL, Vol. I, P-159*

২. *"Without the Yajurveda we cannot understand the Brahmanas and without these we cannot understand the Upanisads."—(HIL, Vol. I, P-163)*

৩. *HIL, Vol. I, P-105*

অথর্ববেদ সংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে, প্রতিটি প্রপাঠক কয়েকটি অনুবাকে, প্রতিটি অনুবাক কতকগুলি সূক্তে এবং প্রতিটি সূক্ত কতিপয় মন্ত্রে বিভক্ত। অথর্ববেদের কুড়িটি কাণ্ডে আটত্রিশটি প্রপাঠক, নব্বইটি অনুবাক, ৭৩১ টি সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে। গদ্য এবং পদ্য উভয় প্রকার মন্ত্রই এখানে পাওয়া যায়। মন্ত্রগুলির মধ্যে পদ্যেরই আধিক্য, এক ষষ্ঠাংশ মাত্র গদ্যে নিবদ্ধ। ঋগ্বেদ থেকে বহু মন্ত্র এখানে গৃহীত হয়েছে। অথর্ববেদের পদ্যাত্মক মন্ত্রগুলি ঋক্‌লক্ষণাক্রান্ত এবং গদ্যাত্মক মন্ত্রগুলি যজুঃলক্ষণান্বিত। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ কাণ্ড গদ্যে রচিত। প্রাচীনকালে গুরুশিষ্যপরম্পরায় অথর্ববেদের প্রায় কুড়িটি শাখার প্রচলন ছিল। আচার্য সায়ণ অথর্ববেদের ভাষ্যভূমিকায় নয়টি শাখার উল্লেখ করেছেন। বর্তমান এই বেদের দুটি শাখা পাওয়া যায়—শৌনকীয় ও পৈপ্পলাদ। শৌনকীয় শাখার অথর্ববেদই এতদিন প্রচলিত ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর অধ্যাপক রোট ও আমেরিকার অধ্যাপক হুইট্‌নি শৌনকীয় শাখার অথর্ববেদ প্রথম প্রকাশ করেন। এই বেদের পৈপ্পলাদ শাখা দীর্ঘকাল যাবৎ অসম্পূর্ণভাবে কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। ডঃ ব্যুহলার কাশ্মীরে পৈপ্পলাদ শাখার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং ১৯০১ সালে তা গারবে (Garbe) কর্তৃক 'The Kashmirian Atharvaveda' নামে প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য উড়িষ্যার পুরী জেলার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে এই শাখার ব্রাহ্মণগ্রন্থ আবিষ্কার করে এই শাখার সম্পূর্ণতা সাধন করেন।

অথর্ববেদ বেদ পর্যায়ভুক্ত কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বেদকে বলা হয় 'ত্রয়ী'। অনেকে মনে করেন ত্রয়ী বলতে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয়কে বোঝায়। আবার অনেকের মতে শ্রৌতযজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদের সম্বন্ধ ছিল, আর সে কারণে ত্রয়ী শব্দদ্বারা এই তিনটি বেদই বাচ্য। অথর্ববেদের সঙ্গে যজ্ঞের কোন সম্পর্ক নেই বলে তা ত্রয়ীবহির্ভূত। অনেকে আবার 'ত্রয়ী' কথাটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে ত্রয়ী হল ত্রিবিধ মন্ত্রের সমষ্টি। এই ত্রিবিধ মন্ত্র হল—ঋক্, সাম ও যজুঃ। অথর্ববেদের মন্ত্র এই তিন প্রকার মন্ত্রেরই লক্ষণাক্রান্ত। অথর্ববেদের মন্ত্রের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। সুতরাং অথর্ববেদকে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত না করার কোন কারণ নেই। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭.১.২) একত্রে চার বেদের উলেখ আছে—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণম্....."। মুণ্ডকোপনিষদেও (১.১.৫) একত্রে চার বেদের নাম পাওয়া যায়—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালেই অথর্ববেদ বেদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও এই বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেছেন। ভিন্তারনিৎস অথর্ববেদের মন্ত্রগুলিকে ঋগ্বেদের যজ্ঞসংক্রান্ত মন্ত্রসমূহের সমসাময়িক বলে মনে করেন—".....the magic poetry of the Atharvaveda is in itself at least as old as, if not older than, the sacrificial poerty of the Rgveda."[১] প্রধান যজ্ঞসমূহে

১. HIL, Vol. I, P-111.

কতকগুলি শান্তি ও পৌষ্টিককর্মে এই বেদের
অথর্ববেদের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও কতকগুলি উপযোগিতা না থাকার
মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। তবে সাক্ষাৎভাবে শ্রৌতযজ্ঞে অথর্ববেদের কোন উপযোগিতা না থাকার
ফলেই সম্ভবতঃ অথর্ববেদ ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত নয়—এরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছিল।
ফলেই সম্ভবতঃ অথর্ববেদ ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত নয়—এরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। অথর্ববেদ সংহিতার দুস্তর

বিষয়বস্তুর দিক থেকে অন্যান্য বৈদিক সংহিতা অপেক্ষা অথর্ববেদ সংহিতার দুস্তর ব্যবধান। অথর্ববেদের ঋষিরা ছিলেন অনেক বেশী পরিমাণে বাস্তববাদী। তাই এখানে ঋগ্বেদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব, দেবতাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস যেমন অনুপস্থিত, তেমনি সামবেদের ভক্তিপূত গীতিময়তার আবেশ কিংবা যজুর্বেদের শ্রৌতকর্মবিধান একান্ত দুর্লভ। অথর্ববেদের ঋষিরা দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জরিত, দুঃস্বপ্ন ও দুর্লক্ষণে আতঙ্কিত, রোগে-শোকে বিপর্যস্ত মানব-জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন সপত্নীভয়ে ভীতা রমণীকে, শত্রুর দ্বারা পীড়িত অসহায় মানুষকে, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের প্রতিহিংসায় অক্ষম অসহায় মনুষ্যজীবনকে। এই সমস্ত রোগ-শোক, অত্যাচার-উৎপীড়ন, প্রাকৃতিক উৎপাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য তাই তাঁরা অধিক মাত্রায় নির্ভর করেছেন ইন্দ্রজাল বা কুহকের উপরে। তাই অথর্ববেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ইন্দ্রজাল বা অভিচারমূলক। যাগযজ্ঞাদির সঙ্গে এই মন্ত্রগুলির বিশেষ কোন সংশ্রব নেই। অথর্ববেদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভিন্তারনিৎস বলেছেন—"After all it is quite a different spirit that breathes from the magic songs of the Atharvaveda than from the hymns of the Rgveda.[১]" অর্থাৎ অথর্ববেদের ইন্দ্রজালমূলক মন্ত্রের সুর ঋগ্বেদীয় সূক্তসমূহের সুর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে অথর্ববেদের মন্ত্রগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ভৈষজ্য মন্ত্র, পিশাচাদির প্রভাব নিবারণমূলক মন্ত্র, আয়ুষ্য মন্ত্র, পৌষ্টিক মন্ত্র, প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র, অশান্তি নিরোধক মন্ত্র, কামনাপূর্তির মন্ত্র, অভিচার মন্ত্র এবং সৃষ্টিরহস্য ও প্রক্রিয়া বিষয়ক মন্ত্র। অথর্ববেদের ঋষিরা রোগব্যাধির নেপথ্যে বিশেষ অসুরের কল্পনা করে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে তাকে দূর করতে চেয়েছেন। তাই জ্বরাসুরের বিনাশের জন্য ঋষিকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—

অয়ং যো বিশ্বান্ হরিতান্ কৃণোষ্যুচ্ছোচয়নগ্নিগিরি বা ভিদুন্বন্।
অধাহি তরামন্নর সো হি ভূয়া অধান্যঙ্‌ভূধরাং বা পরেহি[২]"।।

অশ্মরীরোগ, শূলবেদনা, উদরী, চক্ষুরোগ, বাত, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের মন্ত্র অথর্ববেদে আছে। অসুর, পিশাচ বা রাক্ষসেরা জ্বরের মূল কারণ এরূপ বিশ্বাস তৎকালে প্রচলিত ছিল। এদের প্রভাব থেকে জনপদকে মুক্ত করার জন্য অনেক মন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে। একটি মন্ত্রে রাক্ষসের অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য বলা হয়েছে—

"তপনো অস্মি পিশাচানাং ব্যাঘ্রো গোমতামিব[১]।" অর্থাৎ ব্যাঘ্র যেমন গবাদির দুঃখদায়ক, আমিও তেমনি পিশাচদের তাপদায়ক। দীর্ঘ নীরোগ জীবন এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভের জন্য আয়ুষ্য মন্ত্রের প্রয়োগ করা হত। এই ধরণের একটি মন্ত্রে দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের মত প্রাণকে অভয় দান করে বলা হয়েছে—

"যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ[২]"।।

পৌষ্টিক মন্ত্রসমূহের বিষয়বস্তু হল কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও গৃহনির্মাণে সকল প্রকার বিঘ্নের নিরসন এবং আকস্মিক উৎপাতের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ। অথর্ববেদ সংহিতার ২।২৬, ৩।১৪, ৩।১৭, ৩।২৪, ৬।৫০, ৬।৭৯, ৭।১৮, ৭।৭৫, প্রভৃতি সূক্তে সেই কামনা প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক পাপ করে। যজ্ঞানুষ্ঠানে ত্রুটির জন্যও মানুষকে পাপের ভাগী হতে হয়। সর্ববিধ পাপক্ষয়ের জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রগুলিকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র। এরূপ প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র এই বেদে অনায়াসলভ্য। আর এক শ্রেণীর মন্ত্র অথর্ববেদে পাওয়া যায় যেগুলি পারিবারিক অশান্তি ও মনোমালিন্য দূর করার জন্য প্রযুক্ত হত। যেমন—

"অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাতা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবাম্[৩]।।"

"পুত্র পিতার অনুব্রত হোক, মাতার সঙ্গে একমন হোক, পত্নী পতির উদ্দেশ্যে মধুময় ও শান্তিপ্রদ বাক্য প্রয়োগ করুক।"

মনোমত পতিলাভ, সুখপ্রসব, পুত্রলাভ, গর্ভরক্ষা, স্বামীর ক্রোধ বা অভিমান উপশম, অন্য নারীতে পতির আসক্তি দূর করার জন্য এমন কি অভীষ্ট পুরুষকে বশে আনার জন্য ব্যবহৃত মন্ত্র পাওয়া যায় অথর্ববেদের চতুর্দশ কাণ্ডে। এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রেমমূলক মন্ত্রও এখানে পাওয়া যায়। তৃতীয় এবং চতুর্থ কাণ্ডে কতকগুলি বশীকরণ মন্ত্র পাওয়া যায়। কোন অনিচ্ছুক রমণীর হৃদয়কে কামবাণে বিদ্ধ করে তাকে পুরুষের প্রতি আসক্ত করার জন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"উত্তুদস্ত্বোৎ তুদতু মা ধৃথাঃ শয়নে স্বে।
ইষুঃ কামস্য যা ভীমা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি[৪]।।"

অর্থাৎ 'কাম তোমাকে উত্তেজিত করুক, তুমি আমাকে শয্যায় প্রতিরোধ করো না, প্রচণ্ড কামবাণে আমি তোমার হৃদয় বিদ্ধ করছি।' অনিচ্ছুক পুরুষের প্রতি প্রণয়িনী

১. অথর্ব, সং-৪/৩৬/৬

রমণীর প্রযোজ্য অনুরূপ বশীকরণ মন্ত্র অথর্ববেদ সংহিতার চতুর্থ কাণ্ডের ১৩০ থেকে ১৩৮ সংখ্যক মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

অথর্ববেদের বৃহৎ একটি অংশ জুড়ে আছে অভিচারমন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি শত্রু-নিধনের উপযোগী। শত্রু, সর্প, ভূতপ্রেতাদির উপদ্রব নিবারণের জন্য বিভিন্ন কর্মে এই জাতীয় মন্ত্র ব্যবহৃত হত। আবার অভিশাপের অশুভ প্রভাব থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ব্যবহারযোগ্য মন্ত্রও আছে এখানে। এভাবে অথর্ববেদের বেশীর ভাগ সূক্তেই প্রকট হয়ে উঠেছে যাদুমন্ত্রের সুর। এমন কি দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছে যাদু এবং কুহকের প্রসঙ্গ। যেমন অথর্ববেদের বরুণসূক্তে (৪/১৬) বরুণদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও শেষপর্যন্ত সূক্তটি পাপীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

অথর্ববেদে এমন কিছু মন্ত্র আছে যেখানে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থাপনা করা হয়েছে। কোন কোন মন্ত্রে আবার নিহিত আছে সৃষ্টি রহস্য। এ প্রসঙ্গে কালসূক্ত (১৯/৫৩), স্তম্ভসূক্ত (১০/৭, ১০/৮), প্রাণসূক্ত (১১/৪) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালসূক্তের একটি মন্ত্রে দ্যুলোক—ভূলোককে কাল থেকে সম্ভূত এবং ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত পদার্থ কালের প্রেরণায় প্রকাশিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

"কালোঽমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে[১]।।"

এই কালই সৃষ্টির উৎস এবং নিয়ন্তা। কালেই ব্রহ্ম সমাহিত এবং কালেই নিহিত আছে অমৃতত্ব। তাই বলা হয়েছে—

"কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।
কালো হি সর্বেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতিঃ[২]।।"

এই জাতীয় সূক্তগুলি দার্শনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ এবং অথর্ববেদের ঋষিদের সত্য-দৃষ্টির পরিচায়ক।

বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে অথর্ববেদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এতে একাধারে স্থানলাভ করেছে ইন্দ্রজাল বা কুহকমূলক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্মের পরিচয় এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ। প্রাচীন আর্যদের রীতিনীতি, ভাবধারা, তদানীন্তন ভারতীয় লোকসংস্কৃতি জানার পক্ষে অথর্ববেদ এক মূল্যবান দলিল। চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের ইতিহাসেও অথর্ববেদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর অধিকাংশ মন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-সমৃদ্ধির অন্বেষা। এককথায় অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি লোকহিতৈষণার পরিচয়বাহী। এর থেকে অনুমিত হয় যে, অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অথর্ববেদ এককালে অনেক বেশী জনপ্রিয় ছিল।

১. অথর্ব, সং-১৯/৫৩/৫